আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক অবস্থান: সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ

ইশফাক ইলাহী চৌধুরী

প্রকাশ : ০৬ জুলাই ২০২৩, ১২:৫১

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ফলে আমাদের দেশকে নিয়ে বিশ্বসম্প্রদায়ের আগ্রহ ও কৌতূহল অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশ্ব এখন বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশ হিসেবে নিতে প্রস্তুত এবং বিশ্বসম্প্রদায় প্রত্যাশা করছে বাংলাদেশ যেন অর্থনৈতিক উন্নয়নে অন্য দেশগুলোর জন্য একটি রোল মডেলে পরিণত হয়। শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, বাংলাদেশ যেন সামগ্রিক উন্নয়ন, অর্থাৎ মানবসম্পদ উন্নয়ন, গণতান্ত্রিক চর্চা, আইনের শাসন, সামাজিক সমতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

১৯৭১ সালে নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে, কিন্তু তখন বিশ্বসম্প্রদায় বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে সহজে গ্রহণ করেনি। এটা আমাদের ভালোভাবেই মনে থাকার কথা যে তখন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এই দুটি পরাশক্তির নেতৃত্ব বিভক্ত হয়ে পড়েছিল গোটা বিশ্বে। বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের ব্যাপক সমর্থন থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা শক্তি বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। সেই সময়ে যুক্তরাষ্ট্র চীনের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে ব্যস্ত ছিল এবং পাকিস্তানকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তার বিশেষ প্রয়োজন পড়েছিল। যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের প্রতি সম্পূর্ণ সহায়তার হাত বাড়িয়েছিল, তখন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা পাকিস্তানের সহায়তায় এগিয়ে আসে। তাদের ধারণা ছিল স্বাধীন বাংলাদেশ হবে সোভিয়েত ব্লকের আরেকটি দেশ এবং যেটি পশ্চিমা শক্তির বিরুদ্ধে কাজ করবে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও পশ্চিমা শক্তির বিরোধিতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে এবং জোটনিরপেক্ষ জোটে একটি সক্রিয় সদস্য হিসেবে যোগ দেয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নীতি ‘সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে শত্রুতা নয়’ বাংলাদেশে পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতি হিসেবে গৃহীত হয়।

বিশ্ব গত ৫০ বছর নানাবিধ গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে, বিশেষ করে ১৯৯০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও ওয়ারশ সামরিক জোট ভেঙে গেলে যুক্তরাষ্ট্র একক পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং বিশ্বকে এককভাবে শাসন করে। ১৯৯১ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ঘোষণা করেন যে এখন থেকে মার্কিন নেতৃত্বে এক কেন্দ্রিক বিশ্ব—যা হবে তাঁর ভাষায়, গণতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা। তবে এই বিশ্বব্যবস্থার আয়ু ছিল অল্পদিন। শিগগিরই কমিউনিস্ট শাসিত চীন নতুন শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের একক আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করে। এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের বেশ কিছু অর্থনৈতিক অগ্রসরমাণ দেশ চীনকে তাদের উন্নয়নের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে বেছে নেয়। বেল্ট ও রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই) প্রয়াসকে অনেকেই চীনের ভবিষ্যতের বৈশ্বিক শক্তির নিদর্শন হিসেবে দেখছেন।

দক্ষিণ চীন সাগরের একটি বিরাট অঞ্চলের ওপর চীন একক মালিকানার দাবির প্রতি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের দেশগুলো বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় অরুণাচল রাজ্য এবং লাদাখের ওপর মালিকানার পুরোনো দাবি নতুন করে উত্থাপন করেছে চীন। চীনের উত্থান রুখতে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদেশ

ভারত, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও সিঙ্গাপুর মিলে ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল প্রণয়ন করেছে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের সামরিক জোট কোয়াড তৈরি হয়েছে প্রতিবেশী দেশগুলোর ওপর চীনের সম্ভাব্য সম্প্রসারণবাদ ও আগ্রাসনকে রুখে দিতে।

উল্লিখিত শক্তির কৌশলগত পাওয়ার গেমের কেন্দ্রে এখন বাংলাদেশের অবস্থান। যদি কেউ মানচিত্রের দিকে নজর দেন, তবে সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন বিশ্বের কৌশলগত রাজনীতির কোথায় বাংলাদেশের অবস্থান। প্রস্তাবিত এশিয়ান হাইওয়ে এবং এশিয়ান রেলওয়ে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে যাবে। হিমালয় পর্বতমালার পূর্ব প্রান্ত মিয়ানমার থেকে পশ্চিম প্রান্ত আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের অতিগুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলে বাংলাদেশের অবস্থান, যা দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের যোগাযোগের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। যদি ভারতের অরুণাচল নিয়ে ভারত-চীনের মধ্যে কখনো যুদ্ধ বাধে বা দীর্ঘমেয়াদি কোনো উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, তবে সৈন্য চলাচল ও যুদ্ধের আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি পরিবহনের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের জন্য বাংলাদেশ অতিগুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। সুতরাং এটা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয় যে তখন চীন ও ভারত এবং ভারতের সমর্থক পশ্চিমা শক্তি বাংলাদেশকে নিজেদের পক্ষে রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ তার কূটনৈতিক কৌশল ভালোভাবেই ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। আমরা বিআরআইয়ে যোগ দিয়েছি। ফলে চীন আমাদের অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। পাশাপাশি ভারত, জাপান, কোরিয়া আমাদের প্রধান উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে তাদের ভূমিকা অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশ ইন্দো-প্যাসিফিক নীতি ঘোষণা করেছে, যার সঙ্গে মার্কিন ইন্দো-প্যাসিফিক নীতির গভীর মিল রয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল থাকবে সবার জন্য উন্মুক্ত এবং যার সঙ্গে কোনোভাবেই সামরিক স্বার্থকে মেলানো যাবে না।

এখন পর্যন্ত আমাদের যাত্রা ভালোভাবেই এগিয়েছে। তবে সামনে রয়েছে এই যাত্রাপথের প্রধান চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশের ইন্দো-প্যাসিফিক নীতিকৌশল নিয়ে চীন তার উদ্বেগের কথা জানিয়ে দিয়ে হুমকির সুরে বলেছে, বাংলাদেশ থেকে সহায়তা ও বিনিয়োগ প্রত্যাহার করে নেবে। অপরপক্ষে, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ইস্যু উত্থাপন করে বাংলাদেশের ওপর চাপ প্রয়োগ করছে যুক্তরাষ্ট্র। বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের প্রভাবশালী খেলোয়াড় যুক্তরাষ্ট্র এবং আমাদের দেশের উন্নয়নে এসব প্রতিষ্ঠানের সহায়তা প্রয়োজন। বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের সবচেয়ে বড় অংশীদার যুক্তরাষ্ট্র। অন্যদিকে, আমাদের দেশের মেধাবী শিক্ষিত তরুণদের উচ্চশিক্ষা ও ক্যারিয়ার গঠনের প্রধানতম গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র। স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র আমাদের প্রধান দাতা ও উন্নয়ন সহযোগী। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ও ফোরামে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে সমর্থন ও সহযোগিতা করেছে। যে কারণে দেশটির সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ তার স্বাধীন বিদেশনীতি অবলম্বন করা সত্ত্বেও, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা, মানবাধিকার, সংখ্যালঘু ইত্যাদি বিষয়ে পশ্চিমাদের উত্থাপিত উদ্বেগের বিষয়গুলো আমরা পাশ কাটিয়ে যেতে পারি না। এগুলো আমাদের রাষ্ট্রের সংবিধানেও সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করা আছে। সামরিক অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থানে

আমাদের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা বারবার ধাক্কা খেয়েছে। যার মধ্যে সবচেয়ে বেদনাদায়ক হচ্ছে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা এবং একই বছরের ৪ নভেম্বর জাতীয় চার নেতাকে জেলের অভ্যন্তরে খুন। রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে অবিশ্বাস, সন্দেহ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, একগুঁয়েমি মনোভাব ও আলোচনায় অনীহা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দুর্বল ও কালিমালিপ্ত করেছে। অরাজনৈতিক ব্যক্তিরা কালোটাকা, পেশিশক্তির মাধ্যমে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তার করছে। ১৯৭২ সালের সংবিধানে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু ১৯৭৫-পরবর্তী সময়ে সংবিধান পরিবর্তন করা হয়, ফলে জাতীয় রাজনীতিতে ধর্মীয় উগ্রবাদ ও সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এ ছাড়া, ধর্মীয়, ভাষাগত সংখ্যালঘু মানুষ সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। গত দুই দশকে সরকার ইসলামি জঙ্গি ও তাদের ভয়ংকর মতবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। যদিও জঙ্গিরা সমাজের মূল স্রোতে তেমন কোনো বিঘ্ন ঘটাতে সফল হয়নি, তা সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে সমাজের নানা পর্যায়ে আদর্শিক ও দার্শনিক যুদ্ধ বহাল রয়েছে।

ঔপনিবেশিক সূত্রে প্রাপ্ত আমাদের বিচারব্যবস্থা কায়েমি অদক্ষতার রোগে ভুগছে। অদক্ষ বিচারব্যবস্থার প্রধান শিকার হচ্ছে দরিদ্র ও সমাজের নিম্নস্তরের মানুষ। অবাক হওয়ার কিছু নেই যে অদক্ষ ও বিলম্বিত বিচার কিংবা বিচারহীনতার প্রতি অসন্তুষ্ট মানুষ বিনা বিচারে শাস্তি দেওয়ার বিষয়টিকে অনেক ক্ষেত্রেই স্বাগত জানায়। আমাদের বিচারব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো প্রয়োজন, যাতে বিচার-প্রক্রিয়া কোনোভাবেই প্রলম্বিত না হয়।

আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সব সময় সুবিধাভোগী শ্রেণির প্রতি পক্ষপাত করেছে। ফলে বিগত বছরগুলোতে ক্রমেই ধনী ও দরিদ্রের মাঝে বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও আমরা প্রণিধানযোগ্য আর্থিক সফলতা অর্জন করেছি, তা সত্ত্বেও সরকারের উচিত পেছনে পড়ে থাকা জনগোষ্ঠীর কল্যাণে আরও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া। প্রশাসনিক অদক্ষতা ও ব্যাপক দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে এবং এর বিরুদ্ধে অবশ্যই জয়ী হতে হবে।

নিম্ন আয় থেকে আমরা এখন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে যাচ্ছি। তাই বিশ্ব মিডিয়ায় বাংলাদেশ অধিক মনোযোগ পাচ্ছে। কোনো ত্রুটি থাকলে তা দ্রুত চিহ্নিত করা দরকার এবং প্রতিপক্ষের প্রতি দোষারোপের বদলে তা সমাধানে দ্রুততার সঙ্গে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা যদি সম্ভাবনাগুলো কাজে লাগাতে পারি এবং আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম হই, তাহলে বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত। সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমেই উন্নয়নের পথ ধরে বাংলাদেশ উন্নতি ও সমৃদ্ধির পানে এগিয়ে যাবে।

স্বত্ব : © আজকের পত্রিকা